Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 189 - 201
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

জহির রায়হানের উপন্যাস : বিষয়বস্তু ও শিল্পরীতি

মোরশেদুল আলম
গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এবং
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
উনাহত-সিংড়া কলেজ, বগুড়া, বাংলাদেশ
Email ID: malam2031973@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Bangladesh, Novels, Zahir Raihan, Civil Middle Class, Human Mind, Dynamic, Skillful, Bright Hope, Cinematic, Colorful and Poetic.

Abstract
Although the novels written in the 60's military regime-suppressed subjugated Bangladesh are abundant in numerology, in most of the novels the identity of the novelists' practical experience and experience and the chemical synthesis of life sense is negligible. However, the sensibilities of time-honoured, real-life-experienced deep life-views and the depth of positive life consciousness and social observation have turned the novels into unique and distinctive works of art, Among them, whose name is prominent in his novels is filmmaker, journalist and novelist Zahir Raihan [1933-1972]. In the complex and bloody time course of Bangladesh in the 60s, in the projection of the multi-faceted complexity and social reality of the civil middle class, in the analysis of thinking and psychology, in the revelation of the innermost mysteries of the human mind, in the transformation of the current human life and society's temporal experience and in the application of aesthetic art, this strong and hardworking novelist's 'Shesh Bikeler Maye' (1960), 'Trishna' ' (1962), 'Hajar Bochor Dhore' (1964), 'Arek Falgun' (1969) and 'Borof Gola Nodi' (1969)- In these five novels are undoubtedly distinctive. Zahir Raihan's novels such as lively and dynamic, in the selection of subjects and the skillful arrangement of historical, contemporary and futuristic art visions; Also profound in consonants. Zahir Raihan finds positive art-forms in the dismal social consciousness and conflicting political cycle of the 1960s. Of course, even though his work is often tinged with romanticism due to the sometimes unsophisticated nature of social consciousness, he uses this romantic trait as the central source of a bright hope. In order to reveal

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

the complicated and bloody nature of human life, the novelist has adopted cinematic methods in his novels; As a result, the point of view of individual mind, introspection, soliloquy and psychoanalysis have become important in characterisation. Zahir Raihan is socialist in spirit, democrat in art, romantic in life, emotional and painterly in vision. And for this inevitable reason his novels are emotional, scriptural, colorful and poetic.

Discussion

এক

আমরা জানি, কোনো শিল্পকর্মই দেশকাল বিশ্লিষ্ট নয়। কারণ দেশকালের আলো-বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় প্রাণরস আহরণ করেই শিল্পীমানস হয়ে ওঠে লালিত ও বর্ধিত। মানস-গঠনে ঐতিহ্য ও পরিবেশ পালন করে এক কার্যকর ভূমিকা।[১] ঐতিহ্য-অর্জিত শক্তি নিয়ে শুরু হয় শিল্পীর অভিযাত্রা এবং দেশ-কালের পরিবেশ দ্বারা শিল্পী হতে থাকেন প্রভাবিত ও পরিশীলিত। আর এ কারণেই বিষয় নির্বাচনে এবং ইতিহাস, সমকাল ও ভবিষ্যৎস্পর্শী শিল্পদৃষ্টির সুনিপুণ বিন্যাসে জহির রায়হান [১৯৩৩-১৯৭২]-এর উপন্যাসসমূহ যেমন জীবনমুখী, গতিচঞ্চল; তেমনি ব্যঞ্জনায় গভীরতলবিহারী। ষাটের দশকের বিবর্ণ সমাজচেতনাপ্রবাহ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বময় রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যেও জহির রায়হান সন্ধান করেছেন এক ইতিবাচক শিল্প-উপকরণ। অবশ্য কখনো কখনো সমাজচৈতন্যের না-অর্থক চারিত্র্যের বিপরীতমুখী জীবনদৃষ্টির কারণে তাঁর সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে রোম্যান্টিকতার বর্ণসুষমায় বিশিষ্ট হয়ে উঠলেও, এই রোম্যান্টিক মানস-বৈশিষ্ট্যকে তিনি একটি উজ্জ্বল প্রত্যাশার কেন্দ্রীয় প্রাণবীজ-উৎস হিসেবে ব্যবহার করেছেন; ফলে শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন মানবিক সম্ভাবনার সর্বজাতিক সত্যান্বেষণে। জহির রায়হানের এই সত্য-সন্ধান কেবলমাত্র উপন্যাসের বিষয়-বিন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, শিল্পরীতির ক্ষেত্রেও তা অনিবার্য ফর্ম উদ্ভাবনের সহায়ক হয়েছে।[২] কখনো বিস্তৃত পরিসরে, আবার কখনো-বা সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঔপন্যাসিক-বক্তব্যের গভীরতা নির্মাণে এবং অন্তরমথিত মুহূর্ত-সৃজনের পারদর্শিতা জহির রায়হানের শিল্পদৃষ্টির সংবেদনঘন অবলোকন শক্তিরই সাক্ষ্য বহন করে। জহির রায়হানের 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০), 'তৃষ্ণা' (১৯৬২), 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪), 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) এবং 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) - এই পাঁচটি উপন্যাস উপর্যুক্ত সত্যস্বরূপকে ধারণ করেই হয়ে উঠেছে হীরকখণ্ডের ন্যায় দ্যুতিময়, ব্যঞ্জনাদীপ্ত এবং শিল্পসফল।

দুই

'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০) জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস। এ-উপন্যাসের রোম্যান্টিক প্রেম-কাহিনিকে জহির রায়হান নিজ জীবনবোধের মৌল আবেগের সাথে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন। উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্তশ্রেণির স্বপ্নলালিত জীবন-বাস্তবতা, তার দ্বন্দ্বজটিল ও বিবর্ণ অবস্থার রূপ-স্বরূপ উন্মোচনই 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসের মৌল উপজীব্য।[৩] এই উপন্যাসটি সর্বজ্ঞ কথনে রচিত হলেও তা নায়ক কাসেদ আহমদের দৃষ্টিকোণাশ্রয়ী; অর্থাৎ উপন্যাসের সমগ্র কাহিনিটি উপস্থাপিত হয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদের দৃষ্টিকোণ থেকে। তার আবেগাক্রান্ত স্বপ্নভঙ্গের বেদনাময় শব্দরূপ নির্মাণই ছিল জহির রায়হানের অন্বিষ্ট; এবং তাই কাসেদ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের অন্তর্গহ্বর থেকে গেছে অনালোকিত প্রায়শই।

নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি কাসেদ আহমদ- পেশায় কেরানি, নেশায় কবি; তার যাপিত জীবনে সাধ আছে অফুরন্ত, কিন্তু সাধ্য নেই। তাই সে জাহানারাকে নিয়ে আপনমনে নির্মাণ করে স্বপ্নলোক -

> "একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ। অর্থের প্রতি তার লোভ নেই।
> একগাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসিবাঁদীর স্বপ্নও সে দেখে না।

ছোট একটি বাড়ি থাকবে তার।
শহরে নয়, শহরতলীতে।
যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে, আর আছে নীল সবুজের সমারোহ।
মাঝে মাঝে দু'পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা।"[৪]

-এটি কেবল কাসেদের আত্মগত ভাবনা; জাহানারাকে ভালোবাসে সে, কিন্তু প্রবল দ্বিধামুক্তির অভাবে তা অপ্রকাশিতই থেকে যায় শেষাবধি। অন্য এক নারী সালমার অন্তরাবেদনে একদা সে সাড়া দেয়নি; অথচ পরবর্তীকালে বিবাহিতা সালমার জন্য জাগে তার অন্তর-আক্ষেপ। কাসেদ একজন আন্তরিক, সত্যনিষ্ঠ ও হৃদয়বান পুরুষ; কিন্তু সে বন্ধু হিসেবে যতটা সার্থক, প্রেমিক হিসেবে ততটা নয়। বরং বলা যায়, এই কাসেদ নব-উত্থিত মধ্যবিত্তের আদি- প্রতিভূ চরিত্র। সালমা চরিত্রে দু'টি প্রান্ত উন্মোচিত- কৈশোর ও যৌবন অর্থাৎ বিবাহ-পূর্ব এবং বিবাহ-উত্তর। এমন পর্যায়বদ্ধ আর কোনো চরিত্র এ-উপন্যাসে চিত্রিত হয়নি। জাহানারা চরিত্রটি শেষাবধি রয়ে গেছে অনেকাংশে অস্পষ্ট, অবিকশিত, রহস্যময়। তার মনোগত পরিচয়টি পাঠকের কাছে স্পষ্ট নয়; ফলে চরিত্রটি পাঠকের ভাবনাকে করেছে সঙ্কটাপন্ন। জাহানারার মতো শিউলি চরিত্রটিও রহস্যময়তায় আচ্ছাদিত। উপন্যাসের ঘটনাবর্তে স্বাভাবিক ভাবেই শিউলির সঙ্গে পরিচয় ঘটে কাসেদের। পরবর্তীকালে জাহানারার কাছ থেকে প্রত্যাখান-তাড়িত কাসেদ শিউলির কাছে হয়েছে আশ্রয়প্রার্থী। তবে শিউলি চরিত্রে রহস্যময়তার পাশাপাশি অসঙ্গতি প্রকট হয়ে উঠেছে কখনো কখনো। যুবকদের কাছে তার প্রত্যাশা প্রেম নয়, বন্ধুত্ব। কিন্তু কাসেদের সঙ্গে তার আচরণ বন্ধুত্বের সীমানায় সীমিত থাকে নি। ঘটনাক্রমে শিউলি কাসেদকে বলেছে : 'অদ্ভুত মায়াময় চোখ দু'টো আপনার, দেখলে ভালোবাসতে ইচ্ছে করে'।[৫] অথচ, আত্মমনভূমে যন্ত্রণাতাড়িত নিরাশ্রয় কাসেদের বিয়ের প্রস্তাবে শিউলির বিস্ময়াচ্ছন্ন উচ্চারণ : 'আপনাকে অন্য পাঁচজনের চেয়ে ভিন্ন মনে করতাম বলেই হয়তো এত সহজভাবে মিশতাম'।[৬] -এই অসঙ্গতি শিউলি চরিত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে করেছে বিপর্যস্ত। কাসেদ-ভিন্ন অন্য যে সকল চরিত্র মনোবিশ্লেষণ বর্জিত, তাদের মধ্যে নাহার চরিত্রটি ব্যতিক্রমী। সে অন্যদের তুলনায় স্বল্পবাক, প্রায় নীরব। উপন্যাসের পরিণামী অংশে নাহার বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে এসে কাসেদকে যখন 'নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে।...যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই',[৭] -তখন মনে হয় এমন সাহসী উচ্চারণ স্বল্পবাক এই নারীর পক্ষে যেমন আকস্মিক, তেমনি কিছুটা হলেও বিস্ময়কর। তবে জহির রায়হানের প্রথম রচনা হিসেবে 'শেষ বিকেলের মেয়ে' উপন্যাসটির চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনি-গ্রন্থনে কিছুটা দুর্বলতা থাকলেও বাঙালি মধ্যবিত্ত-জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র নির্মাণে এটি হয়ে উঠেছে একটি বাস্তব ও শিল্পসম্মত কথাচিত্র। বিশেষত, আঙ্গিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের চলচ্চিত্রানুগ-রীতির প্রয়োগ উপন্যাসটিকে করে তুলেছে শিল্পিত ও সাফল্যমণ্ডিত এবং এ-ক্ষেত্রে প্রথাগত বর্ণনারীতি ব্যবহৃত হলেও বহুমাত্রিক রঙের 'ইম্প্রেশন' সৃষ্টির দক্ষতা জহির রায়হানের ফর্ম সচেতনতারই সাক্ষ্যবহ -

"আকাশের রঙ বুঝি বারবার বদলায়।
কখনো নীল। কখনো হলুদ।
কখনো আবার টকটকে লাল।
মাঝে মাঝে যখন সাদা-কলো মেঘগুলি ইতি উতি ছড়িয়ে থাকে আর সোনালি সূর্যের আভা
ঈষৎ বাঁকা হয়ে যখন সহস্র মেঘের গায়ে লুটিয়ে পড়ে তখন মনে হয়, এর রঙ একটি নয়, অনেক।
এখন আকাশের কোনো রঙ নেই।"[৮]

- এভাবেই কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদের অন্তর্জগতের রূপ-রূপান্তরকে বর্ণ ও বর্ণান্তর প্রক্রিয়ায় সঙ্কেতময় করে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক জহির রায়হান।

তিন

'তৃষ্ণা' (১৯৬২) উপন্যাসে জহির রায়হান দেখিয়েছেন নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবনের বহুলাঙ্গিক স্তর-বিন্যাস। কোন্দলপ্রিয় মানবজীবনের কোলাহলময় পরিপার্শ্ব-প্রতিবেশ নির্মাণে উপন্যাসটি স্বাভাবিক ভাবেই হয়ে উঠেছে বাস্তবতাস্পর্শী এবং শিল্পসফল। কেন্দ্রীয় চরিত্র শওকত ও মার্থার চিরন্তন জীবনতৃষ্ণা এবং আর্থিক অভিঘাতে তাদের স্বপ্নভঙ্গের আলেখ্য নির্মাণ

এই ‘তৃষ্ণা’ উপন্যাসের লক্ষ্যবিন্দু এবং এর সমান্তরালে নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণির শাহরিক জীবনের স্বপ্ন, সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে প্রবহমান।

‘শেষ বিকেলের মেয়ে’র মতো ‘তৃষ্ণা’ উপন্যাসটি সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশিত হলেও ঔপন্যাসিক সমগ্র ঘটনাস্রোতটি প্রত্যক্ষ করেছেন নায়ক শওকতের দৃষ্টি-সমগ্রতায়। উপন্যাসটির প্লট-বিন্যাসে অবলম্বিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের শিল্পরীতি-ভাবনার এক বিশেষ কৌশল। উপন্যাসের সূচনাংশে উন্মোচিত হয়েছে পরিণতি-অংশ। অন্তিক অংশটি আবার দু’টি শাখা-অংশে বিভক্ত; আর এই বিভক্তিগত শূন্যতা পূরণ করেছে মূল কাহিনি। ফলে পরিচর্যার দিক থেকে ‘তৃষ্ণা’ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে ‘ফ্ল্যাশব্যাক’ পদ্ধতি-আশ্রয়ী।

শওকত, মার্থা গ্রাহাম, আহমদ হোসেন, সেলিনা, বউ পেটানো কেরানি, হারুন, জাহানারা, কিশোরী আয়েশা প্রভৃতি বহুবর্ণময় চরিত্রের সমাবেশে এ-উপন্যাসে রূপায়িত হয়েছে সামাজিক অবক্ষয়ের বিকৃততম কুৎসিত চেহারা। ‘তৃষ্ণা’ উপন্যাস থেকে কতিপয় হীরকোজ্জ্বল দীপিত দৃষ্টান্ত -

১. “ত্রিকোণ উঠোনের মাঝখানে মহিলারা প্রচণ্ড কলহে মেতে উঠেছে। এ ওর চুল ধরে টানছে। এ ওর পিঠের ওপর একটানা কিল-ঘুঁষি মারছে। দুটো নেড়ী কুত্তা ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে বারবার লাফাচ্ছে আর ঘেউ ঘেউ করছে।”[৯]

২. “আজ পনেরো বছর ধরে দেখে আসছি। আসে আর যায়। বামুন কায়েথ বলো, আর মোল্লা মৌলবী বলো, সব বেটাকে চিনে রেখেছি। দিনের বেলা কোট-প্যান্ট পরে সাহেব সেজে অফিসে যায়, আর যেই না সন্ধ্যা হল, অমনি বাবু মুখে রুমাল গুঁজে চট করে ঢুকে পড়ে গলিতে...শালার সাহেবের বাচ্চারা ওদের যে গার্ল বলে ডাকে! যেন নাম পাল্টে দিলেই ধর্ম পাল্টে গেলো আর কি!”[১০]

৩. “জায়গাটা একেবারে অন্ধকার। আলো থেকে এলে পাশের মানুষটাকেও ভালো করে দেখা যায় না। পকেট থেকে একটা দিয়াশলাই বের করে জ্বাললো সে, আর তার আলোতে যেন ভূত দেখলো শওকত। সিঁড়ির নিচে জড়ো করে রাখা একগাদা আবর্জনার মাঝখানে জুয়াড়ীদের একজন লোক খলিল মিস্ত্রীর বউকে জড়িয়ে শুয়ে রয়েছে।”[১১]
- এই চিত্রগুলো আমাদের প্রিয় তিলোত্তমা নগরী ঢাকার। এখানেই নেড়ি ‘কুত্তা’ বা কুষ্ঠ রোগীর মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে গাদাগাদি করে থাকে নিচুতলার সেই সব মানুষ, যারা ভাগ্য-বিড়ম্বিত, স্বপ্ন-তাড়িত, দরিদ্র, মানবিক মূল্যবোধ বিচ্ছিন্ন- যাদের পরিচ্ছন্ন-পরিশীলিত জীবন বলতে কিছুই নেই আসলে অবশিষ্ট আর।

‘তৃষ্ণা’ উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে নাগরিক জীবনের বহুমাত্রিক কদর্যতার খণ্ডিত চিত্রই কেবল আঁকেননি জহির রায়হান, তাঁর সংবেনশীল শিল্পদৃষ্টি সম্প্রসারিত হয়েছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের অলি-গলিতে, আনাচে-কানাচে। সেখানেও আছে হৃদয়হীন পাষণ্ড নরপশু, জোতদার সামন্ত শোষক, বিকৃত রুচির কামুক মহাজন- যারা অবলীলায় লুণ্ঠন করে কিশোরীর অপুষ্ট যৌবন। জহির রায়হানের ‘সিনেমাটিক’ পরিচর্যা -

> “গ্রাম ছেড়ে দলে দলে মাঠে ছুটে এলো ছেলে বুড়ো মেয়ে।
> সোনালি ধানের বুক উঁচু ক্ষেত।
> তার মাঝখানে শুয়ে জীবনের শেষ ঘুম ঘুমাচ্ছে আয়েশা।
> চারপাশের পাকা ধানগাছগুলো অনেকখানি জায়গা জুড়ে মাটির সঙ্গে মিশে আছে।
> অনেকগুলো পাকা ধান ঝরে পড়ে আছে শুকনো মাটির বুকে।
> যে টুকরিতে করে মোয়া বিক্রি করতো, সেটাও পাওয়া গেল অদূরে।
> মোয়াগুলো সব ছড়িয়ে আছে চারপাশে।
> সোনালি ধানের কোলে শুয়ে আছে আয়েশা।
> ওর সারা মুখে অসংখ্য আঁচরের দাগ।
> ওর অপুষ্ট স্তনের কোল ঘেঁষে দুটো ক্ষত।
> রক্তের একজোড়া ফিনকি বোঁটা ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে একগোছা ধানের শীষের ওপরে।”[১২]

বলাবাহুল্য, কেবলমাত্র আয়েশাই নয়; সামাজিক নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীন পাশবিকতা আর নৃশংসতার ছোবল থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই যেন কারো। উপন্যাসের নায়ক শওকত, নায়িকা মার্থা গ্রাহাম- ওরাও সামাজিক নিষ্ঠুরতা, কদর্যতা, অবক্ষয় ও নৃশংসতার শিকার। মার্থার মাকে ধোঁকা দিয়েছিল এক নিগ্রো পুরুষ; কামুক, বিবেকবর্জিত সে-ও। আর শওকত -

"গত উনিশ বছর ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়েও এখনো জীবনের একটা স্থিতি এলো না।

প্রথমে খিদিরপুরের জাহাজঘাটে, তারপর এক বাঙালিবাবুর আটাকলে।

মাঝে কিছুকাল একটা রেলওয়ে অফিসে। ফাইল ক্লার্ক। তারপর কোনো এক নামজাদা রেঁস্তোরা কাউন্টারে। ছ'মাস। সেটা ছেড়ে এক মলম কোম্পানীর দালালী করেছে অনেক দিন।

এক শহর থেকে অন্য শহরে। ট্রেনে, স্টিমারে।

এরপর বছর দু'এক জনৈক সুতো ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করেছে শওকত। তারপর আগাখানী আহমদ ভাইয়ের আধুনিক বেকারীতে। ওখানে বেশ ছিলো, কিন্তু টিকতে পারলো না। ছেড়ে দিয়ে একটা আধা সরকারি ফার্মে টাইম ক্লার্কের চাকুরি নিলো শওকত। দশটা-পাঁচটা অফিস। মন্দ লাগতো না।

কিন্তু ফাটা কপাল। বেতন বাড়ানোর ব্যাপার নিয়ে একদিন বড় সাহেবের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। আর তার খেসারত দিতে গিয়ে সাতদিনের নোটিশে সে অফিস ছাড়তে বাধ্য হল।

সেই থেকে আবার বেকার।"[১৩]

মাহমুদের তো তবু চাকুরি ছিল, চাকুরি ছিল কাসেদেরও; কিন্তু শওকত আরো বেশি ভাগ্যতাড়িত, শেকড়হীন বৃক্ষ যেন। শুধু শওকতই নয়, এই বিবেকহীন সমাজে মার্থা- যে চাকুরি করতো এক বিবেকবর্জিত রাতকানা মহাজনের দোকানে, শওকতকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলে দোকান থেকে ওষুধ চুরি করে চলে যায় জেলে; আর সেলিনা- যার সংক্ষিপ্ত ব্লাউজের নিচে উদ্ধত যৌবন, বাদামি অধরে মদিরাভাস, ভালোবাসতো শওকতকে খুব গোপনে- এরা সবাই ক্রমাগত অনিবার্য নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের পুতুলে পরিণত হয়। আসলে বৈষম্যহীন, কদর্যময়, বিবেকবর্জিত সমাজে বর্বরতার পুনরাবৃত্তি চলে এমনি ধারায়, বারংবার।

'তৃষ্ণা' উপন্যাসের পরিণতি-পর্বের শেষাংশে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান নির্মাণ করেছেন একটি রোম্যান্টিক 'খড়গাদা'। এই খড়গাদার পাদদেশে শওকতের বুকে মুখ রেখে ঘুমিয়ে আছে সেলিনা; এবং তখনকার গীতল ও চিত্রল পরিচর্যা -

"একটি সুন্দর সকাল।
বুড়ো রাত বিদায় নেবার আগে বৃষ্টি থেমে গেছে।
তবু তার শেষ চিহ্নটুকু এখানে সেখানে ছড়ানো।
চিকন ঘাসের ডগায় দু'একটি পানির ফোঁটা সূর্যের সোনালি আভায় চিক্-চিক্ করছে।
চারপাশে রবিশস্যের ক্ষেত।
হলদে ফুলে ভরা এক পূর্ণযৌবনা নদী।
ওপারে তার কাশবন। এপারে অসংখ্য খড়ের গাদা।
ছেলেটির বুকে মুখ রেখে, খড়ের কোলে দেহটা এলিয়ে দিয়ে মেয়েটি ঘুমোচ্ছে।...
সহসা গাছের ডালে বুনো পাখির পাখা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল।
মটরশুটির ক্ষেত থেকে একটা সাদা খরগোশের বাচ্চা ছুটে পালিয়ে গেল কাছের অরণ্যের দিকে।
খড়ের কোলে জেগে উঠলো অনেকগুলো পায়ের ঐকতান।
আঠারো জোড়া আইনের পা ধীরে ধীরে চারপাশ থেকে এসে বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়ালো ওদের।
ওরা তখনো ঘুমোচ্ছে।"[১৪]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

-আঠারো জোড়া আইনের পদধ্বনি চিত্রল ও চলচ্চিত্রানুগ প্রক্রিয়ায় উপস্থাপিত বলে উপন্যাসের সমাপ্তিকে করেছে সঙ্কেতময়, গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। বলাবাহুল্য, ব্যক্তিমানসের রক্তাক্ত জীবনবোধ, রোম্যান্টিক বিচ্ছিন্নতা, বিষণ্ণতা ও নৈঃসঙ্গ্য, হার্দিক রক্তক্ষরণ, সামাজিক অবক্ষয়, কদর্যতা, ক্লেদ-গ্লানি আর স্বপ্নময় জীবনের অপমৃত্যু মিলেমিশে একাকার হয়ে 'তৃষ্ণা' উপন্যাসকে দান করেছে স্বতন্ত্র মাত্রা।

চার

পূর্বের দু'টি উপন্যাসের নগরজীবনের আবর্ত ছেড়ে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান এবার অবতরণ করলেন গ্রামীণ জীবনে। তাঁর 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) উপন্যাসে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে হাজার বছরের সীমানায় প্রসারিত 'আবর্তন-সঙ্কুল অথচ বিবর্তনহীন' পূর্ববাংলার গ্রামীণ জীবন। বলাবাহুল্য, সঙ্গতকারণেই তাই গ্রামীণ সামন্তসমাজের অন্তঃঅসঙ্গতি, শ্রমনির্ভর শোষণমূলক জীবনব্যবস্থায় নারীর বিপন্ন অস্তিত্ব এবং মানবতার চরম পরাভব ও রোম্যান্টিক সম্ভাবনার চিত্ররূপ হিসেবে এ উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অনবদ্য।[১৫] পরিচর্যার ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক তাঁর পূর্বাপর উপন্যাসের মতো এখানেও ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ; এবং এ উপন্যাসে প্লট-বয়নের সরল রৈখিকতা অনেকাংশে হয়েছে পরিত্যক্ত- এই নবতর কৌশল তাঁর শিল্পরীতি-অভীপ্সার বিশিষ্ট প্রান্তকেই নির্দেশ করে মূলত। গ্রামীণ সমাজবাস্তবতায় ভূমি ও মানুষের অচ্ছেদ্য বন্ধন, গ্রামীণ কুসংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি এবং লোকজ জীবনসংস্কৃতির বহুমাত্রিক প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে বহুবর্ণিল ঘটনা এবং উপঘটনায় বিধৃত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সমালোচকের অভিমত স্মরণীয় -

> "জহির রায়হান তাঁর এই উপন্যাসে বাংলাদেশের মানুষের শাশ্বত গ্রামীণ জীবনের হাজারো টানাপোড়েনের চিত্র এঁকেছেন। লোকজ জীবনসংস্কৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সাবলীল ভাবে তাঁর এই উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। ঘটনার ধারাপাতে এই উপন্যাসের খণ্ড খণ্ড অংশ বাস্তবিকভাবে দেশ-কাল-সমাজকে প্রকাশ করেছে শিল্পিত ভঙ্গিমায়। এই উপন্যাসে কাহিনির গতিপ্রবাহ আর গ্রামীণ জীবনের বহুবিচিত্র দিককে উপন্যাসে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে ভূমি ও মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সম্পর্কটি।"[১৬]

'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের মূল ঘটনার ব্যাপ্তিকাল একবছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে সীমিত। 'শাপলা তোলা' শরৎ থেকে পরবর্তী বর্ষাকাল-এই সময়কালের মধ্যে নির্মিত হয়েছে উপন্যাসটির যাবতীয় ঘটনাবর্ত। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত একটি নিজস্ব সাবলীল গতিচ্ছন্দ নির্মাণে হয়েছে সক্ষম; তবে সে গতিচ্ছন্দ সর্বত্র অক্ষুন্ন থাকেনি- মকবুল তার স্ত্রীদের তালাক দেয়ার পর থেকেই উপন্যাসের কাহিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় হয়েছে পরিণতিগামী। এই উপন্যাসের অনিবার্য চরিত্র বুড়ো মকবুলের স্ত্রী-সংখ্যা তিন- এই তিন স্ত্রীর কোনোটারই স্বামী হতে পারেনি সে, হয়েছে মালিক। বস্তুত, স্ত্রীদের সাথে তার সম্পর্ক শুধু মালিক-শ্রমিকের; তাদের শ্রমকে সে ব্যবহার করে উপার্জন-কর্মে -

> "জোড়া বউকে ঢেঁকির ওপর তুলে দিয়ে রাত জেগে ধান ভানে বুড়ো মকবুল।
> পিদিমের শিখাটা ঢেঁকির তালে তালে মৃদু কাঁপে।

মকবুল ধমকে ওঠে বউদের, কি, গায়ে শক্তি নাই? এত আস্তে ক্যান? আরো জোরে চাপ দাওনা, হুঁ।
এমন ভাবে গর্জে ওঠে মকবুল, যেন মাঠে লাঙ্গল ঠেলতে গিয়ে রোগা লিকলিকে গরু জোড়াকে ধমকাচ্ছে সে।"[১৭]

- এবং পরবর্তীতে মকবুল ঐ একই কারণে বিয়ে করে ঘরে আনে দুরন্ত যৌবনা আম্বিয়াকেও। কিন্তু সে স্বামী হিসেবে কঠোর ও নির্দয় হলেও ব্যক্তি হিসেবে কোমল। কন্যা হিরণের বিয়েতে মকবুলের পিতৃত্ব সজীব, কোমল ও সফল। আবুলের প্রহৃত স্ত্রী হালিমার প্রতি সে হয়ে ওঠে সংবেদনশীল। এছাড়াও, একই বাড়ির জ্ঞাতি যুবক মন্তুর বিয়ের ভাবনা তাকে করে তোলে দায়িত্বসচেতন। মকবুল-চরিত্রটি পল্লিবাংলার একটি বিশেষ শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে একথা বলা চলে নিঃসন্দেহে।

মন্তু মিয়া 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের রোম্যান্টিক অংশের নায়ক; কিন্তু নায়িকা টুনির তুলনায় অনেকটাই নিষ্প্রভ। আশৈশব মাতৃ-পিতৃহীন দরিদ্র যুবক মন্তু জীবন-সংগ্রামে যতটা সক্রিয়, প্রেমের ক্ষেত্রে ততটা নয়। মন্তু মিয়ার জীবনে দু'টি ভিন্ন-প্রান্তিক নারীর পদপাত লক্ষণীয়; এবং ঘটনাক্রমে দু'জনই মকবুলের যুবতী স্ত্রী- একজন টুনি, অপর জন আম্বিয়া। এরা পরস্পর বিপরীত প্রান্ত থেকে মন্তুকে আকর্ষণ করে- টুনির আকর্ষণ হৃদয়গত, আর আম্বিয়ার আকর্ষণ দেহগত। উভয় আকর্ষণের মধ্যবর্তী মন্তু মিয়া হয়ে উঠতে পারতো সঙ্কটাপন্ন, দ্বন্দ্বমুখর; অথচ সে সম্ভাবনা ব্যবহৃত হয়নি

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসের কাহিনিবৃত্তে। হৃদয়মাধুর্য, প্রাণপ্রাচুর্য, সজীবতা ও সক্রিয়তায় টুনি সঙ্গতকারণেই এ-উপন্যাসের নায়িকা। টুনি আসলে জহির রায়হানের নির্মিত চরিত্র নয়, হয়ে-ওঠা চরিত্র। তার তারুণ্য ও প্রাণচাঞ্চল্য বুড়ো মকবুলের তৃতীয় স্ত্রী হওয়ার কারণে থাকে অচরিতার্থ, গোটা উপন্যাস জুড়েই; ফলে মন্তুর সঙ্গে তার হার্দিক সম্পর্ক হয়ে ওঠে অনিবার্য। আম্বিয়াকে সতীন হিসেবে বরণ করতেও তার দ্বিধা নেই, কিন্তু মন্তুকে হারাতে প্রস্তুত নয়- আর এ-কারণেই সম্পদশালী আম্বিয়াকে বিয়ে করবার জন্য মকবুলকে প্রলুব্ধ করে সে। টুনির এই হৃদয়াবেগ ও অন্তর্বেদনা পাঠককে সর্বাধিক মাত্রায় আকৃষ্ট করে। মকবুলের মৃত্যুর পর অকাল-বৈধব্যকে বরণ করেছে সে, কিন্তু মন্তুকে স্বামী হিসেবে বরণ করেনি। পিত্রালয়গামী টুনি মন্তুর নৌকায় হয়েছে আরোহী, কিন্তু বাধাবন্ধনহীন নিরাপদ স্থানে পরম প্রত্যাশিতকে পেয়েও টুনি তাকে গ্রহণ করেনি; বরং তার সঙ্গে মন্তুর ঘর-বাঁধার প্রস্তাবকে করেছে প্রত্যাখ্যান -

> "টুনির চোখের কোণে তখন দু'ফোটা জল চিক চিক করছে।
> অত্যন্ত ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো সে।
> আর অতি চাপা স্বরে ফিসফিস করে বললো- 'না, তা আর অয়না মিয়া।'
> 'তা আর অয় না।'
> বলতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো সে।"[১৮]

-নিদারুণ অভিমান টুনিকে এরূপ প্রত্যাখ্যানের প্রবর্তনা দিয়েছে। আম্বিয়ার সঙ্গে বিয়েতে মন্তুর সম্মতি তাকে করে তুলেছে ক্ষুব্ধ ও অভিমানী। তুলনাসূত্রে বলা চলে, ব্যক্তিত্ব প্রকাশে টুনি অপেক্ষা আম্বিয়া অনেক বেশি প্রাগ্রসর। তার ব্যক্তিত্ব গ্রামীণ সমাজ-কাঠামোর প্রেক্ষাপটে বিদ্রোহী বলে মনে হয়। সৌন্দর্য, দুরন্ত যৌবন, কঠোর কর্মশক্তি ও অভিভাবকহীনতা তাকে করে তুলেছে আত্মসচেতন, বেপরোয়া। এ-উপন্যাসের অপরাপর চরিত্র সালেহা, আমেনা ও ফাতেমা হয়ে উঠেছে গ্রামবাংলার শাশ্বত নারী। আবুল একটি প্রস্তর-কঠোর, অমানবিক ও অবিকশিত চরিত্র। করিম শেখ, গনুমোল্লা, সুরত আলী, আপন আপন অবস্থানে সরলতায় ভাস্বর। ওলাবিবি, ভূতের আছর প্রভৃতি লৌকিক সংস্কার এবং বিয়ের আসর, গাজী-কালু-চম্পাবতী ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি-পাঠের আসর ইত্যাদি সজীব গ্রামীণ চিত্র নির্মাণে এবং বহুবর্ণিল চরিত্র সৃজনে 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসে জহির রায়হানের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। উপন্যাসটির সমাপ্তি হয়েছে এভাবে: 'সুর করে ঢুলে ঢুলে একমনে পুঁথি পড়ছে সে। রাত বাড়ছে। হাজার বছরের পুরনো সেই রাত।'[১৯] -এই শিরোনাম-বিধৃত তাৎপর্য প্রতিপাদনের লক্ষ্যেই ঔপন্যাসিক এই পরিচ্ছেদটির আয়োজন করেছেন। চিত্ররীতি, চলচ্চিত্র-রীতি এবং টোন্-রীতির পরিচর্যা উপন্যাসটির শিল্পপ্রকৌশলে সংযোজন করেছে প্রাতিস্বিক মাত্রা।

পাঁচ

'শেষ বিকেলের মেয়ে' ও 'তৃষ্ণা'র নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবন আর 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জীবন ছেড়ে জহির রায়হান এবার অবতীর্ণ হলেন রাজনৈতিক আবর্তে, 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৯) উপন্যাসের মাধ্যমে। তাঁর এই উপন্যাসটি বিষয়-গৌরবে সমুজ্জ্বল; কারণ বায়ান্ন সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এটির পটভূমি নির্মাণ করেছে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্তস্নাত ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে জহির রায়হান কারাবরণ করেন। এরপর ১৯৫৫ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি বা আট-ই ফাল্গুন উদযাপনের ওপর আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে আবারো কারারুদ্ধ হন তিনি। ১৯৫৫ সালের এই ফাল্গুনকে কেন্দ্র করেই 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসটি রচিত। মূলত এই দিনটি পালনের কাহিনি বর্ণনাই হলো ঔপন্যাসিকের মৌল অভিপ্রায়। ষাটের দশকের সামরিক শাসনপীড়িত পরাধীন বাংলাদেশে একজন শিল্পীর সৃষ্টিশীল চৈতন্যে একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামী প্রেরণা কতটা জীবন্ময় রূপ ধারণ করতে পারে, জহির রায়হানের 'আরেক ফাল্গুন' তার সার্থক শিল্পসাক্ষ্য। ভাষা আন্দোলন মৌল উপজীব্য হলেও, এই উপন্যাসের বিষয় সময় ও সমাজবোধের গভীরতায় সার্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বজাতিক জীবনচেতনায় প্রোজ্জ্বল। আসাদ, মুনিম, রসুল, সালমা প্রভৃতি চরিত্র বিশেষ কালবৃত্তে আবদ্ধ না থেকে মানবীয় সংগ্রামশীলতা, তার প্রত্যাশা, অচরিতার্থতা ও রক্তক্ষরণ এবং আত্মত্যাগী অথচ মরণজয়ী অনুভবের প্রতিবিম্ব হয়ে উঠেছে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পক্ষ-বিপক্ষ চরিত্র অঙ্কনে আর ঘটনার শাখা-প্রশাখা নির্মাণে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে সর্বজ্ঞ দৃষ্টিগ্রাহ্য। ছাত্রনেতা মুনিম, আসাদ, ডলি, সালমা ও তার স্বামী রওশন, নারী লিপ্সু গোয়েন্দা অফিসার মাহমুদ, মতি ও মধু ভাইয়ের রেঁস্তোরা, জাহানারা ও তার স্বামী, কবি বজলে হোসেন, সাহানা, সালেহা, রাহাত, তসলীম, শাহেদ- এমনি অসংখ্য চরিত্র ও দৃশ্যাবলির গ্রন্থন-নৈপুণ্যে নির্মিত হয়েছে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পরিচ্ছন্ন একটি প্লট। উপন্যাসের ব্যাপ্তিকাল মাত্র তিন দিন, দুই রাত। প্রথম দিনের কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে কাহিনির সূচনা। প্রথম দিন ও রাত এবং দ্বিতীয় দিন ও রাত ধরে চলেছে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের বিরতিহীন প্রস্তুতি। তৃতীয় দিনটি কাহিনির চূড়ান্ত কাল- মিছিল ও পুলিশী সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে এই চূড়ান্ত অধ্যায়টি; এবং অতঃপর দিনান্তে কারাতোরণ প্রাঙ্গনে কাহিনির পরিসমাপ্তি। কাহিনির ব্যাপ্তিকাল সীমিত, কিন্তু ঘটনা-উপঘটনা বিস্তৃত; আর এ-কারণেই উপন্যাসটি তাই গতিহীনতায় আক্রান্ত নয়; তবে তৃতীয় দিনের কাহিনি সর্বাধিক মাত্রায় গতিময়।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের নির্মম স্মৃতি-বিজরিত ভিক্টোরিয়া পার্কের বর্ণনা দিয়ে উপন্যাসের সূচনা -

> "এবারে শীত পড়েছিলো একটু বিদ্ঘুটে ধরনের।
> দিনে ভয়ানক গরম। রাতে কনকনে শীত।
> সকালের কুয়াশায় ঢাকা পড়েছিল পুরো আকাশটা।
> আকাশের অনেক নিচু দিয়ে মন্থর গতিতে ভেসে চলেছিল এক টুকরো মেঘ।
> উত্তর থেকে দক্ষিণে।
> রঙ তার অনেকটা জমাট কুয়াশার মতো দেখতে।
> ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে ঠিক সেই মেঘের মতো একটি ছেলেকে হেঁটে যেতে দেখা গেলো নবাবপুরের দিকে।
> দক্ষিণ থেকে উত্তরে।
> পরনে তার একটা সদ্য ধোয়ানো সাদা সার্ট। সাদা প্যান্ট।
> পা জোড়া খালি।
> জুতো নেই।"[২০]

-এই ছেলেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মুনিম, 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের নায়ক। সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতিবিধুরতা উপন্যাসের সূচনাংশকে করেছে তাৎপর্যবহ এবং বর্ণনাংশে নৈসর্গিক পরিচর্যা কাহিনিকে করেছে সঙ্কেতময়। মেঘের গতি 'উত্তর থেকে দক্ষিণে,' আর মুনিমের গতি 'দক্ষিণ থেকে উত্তরে'- কাহিনি বর্ণনার এই অংশে সঙ্কেতটি হয়েছে শিল্পময়, গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। জহির রায়হান যখন এ-উপন্যাসটি রচনা করেন, তখন সমগ্র বাঙালি জাতি এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনসমূহের এগারো দফা কর্মসূচির বেগবান ঐক্যপ্রবাহ তখন পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসনের ভিত্-কে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। জাতীয় জীবনের ঐ অগ্নিমুখী পরিস্থিতিতে ঔপন্যাসিক আলো-অন্ধকারের দোদুল্যমানতা থেকে উপন্যাস-অর্ন্তগত চরিত্রসমূহকেই কেবল মুক্তি দান করেননি, বাঙালি জাতির সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎকেও করেছেন প্রত্যক্ষ -

> "কবি রসুল চিৎকার করে উঠলো, জেলখানা আরো বাড়ান সাহেব। এত ছোট জেলখানায় আর হবে না।
> আর একজন বললো, এতেই ঘাবড়ে গেলেন নাকি?
> আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।"[২১]

- 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের শেষাংশে উচ্চারিত সুদূরপ্রসারী, অনির্বাণ আলোকশিখার মতো দীপ্তিময় এই সংলাপ 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো'-এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে অদূর ভবিষ্যতে বিরতিহীন আন্দোলনের সম্ভাবনাময় ইঙ্গিত। এ-ক্ষেত্রে সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -

> "বায়ান্নর রক্তস্নাত ভাষা-আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে এ-উপন্যাস। সামরিক-শাসনের নিগ্রহের মধ্যে বাস করেও, একুশের মর্মকোষ-উৎসারিত 'আরেক ফাল্গুন' পাঠ করে আমরা হয়ে উঠি সাহসী

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষ; আসাদ-মুনিম-রসুল-সালমার মতোই নির্ভীক-চিত্তে আমরাও বলে উঠি- 'আসছে ফাল্গুনে আমরা কিন্তু দ্বিগুণ হবো।"[২২]

উপন্যাসের রাজনৈতিক ঘটনাবৃত্ত ও প্রণয়াবর্ত- উভয় অংশের নায়ক ছাত্রনেতা মুনিম। সে সারল্য ও আন্তরিকতায় পরিপুষ্ট এবং নীতিনিষ্ঠা ও কর্তব্যবোধে অবিচল এক তরুণ। এ-কারণেই আমরা দেখি নগ্নপায়ে যখন মুনিম আসে বান্ধবী ডলির জন্মদিনে, তখন ডলির শত অনুরোধেও কিছুক্ষণের জন্য স্যান্ডেল পরে 'ইম্-মোরাল' হতে চায়নি সে। মুদ্রণকার্য, কালো ব্যাজ বিতরণ, কালো পতাকা উত্তোলন, শ্লোগান ও অন্যান্য সাংগঠনিক কর্মানুষঙ্গে মুনিমের সক্রিয়তা বিরামহীন। মুনিমের বন্ধু আসাদও একজন রাজনৈতিক ছাত্রকর্মী, প্রতিবাদী, একনিষ্ঠ বিপ্লবী এবং রাজনৈতিক ঘটনাস্রোতে সারাক্ষণ থাকে কর্মচঞ্চল, ক্লান্তিহীন। উপন্যাসের চূড়ান্ত ঘটনাংশে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে আসাদ হয়ে ওঠে অসমসাহসী। ডলি বিত্তবান পরিবারের মেয়ে; মুনিমের প্রতি সে যতটা অনুরক্ত, তার আদর্শের প্রতি ততটা বিরক্ত ও নিরাসক্ত। মুনিমের প্রতি প্রত্যাখ্যানপত্র প্রেরণ তার চিত্তভারল্যকেই উন্মোচন করেছে মূলত। উপন্যাসের পরিণামী অংশে ডলি চালিত হয়েছে পরিবর্তনের পথে; মুনিমের গ্রেপ্তারী সংবাদ এবং কবি বজলে হোসেনের কপটতা ও মিথ্যাচারিতা ডলির এই মানসিক পরিবর্তনে দিয়েছে প্রবর্তনা। উপন্যাসের অন্তিমে ডলি ফিরে আসে মুনিমের কাছে, কারাতোরণ প্রাঙ্গনে; তাকে নিবেদন করে একগুচ্ছ পুষ্পার্ঘ্য -

"ডলি এগিয়ে এসে একমুঠো ফুল গুঁজে দিল ওর হাতের মধ্যে।
কিছু বললো না।
মাটিতে চোখ নাবিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো।...
স্বল্প অন্ধকারেও ডলির চোখ জোড়া পানিতে ছলছল করছে।"[২৩]

'একমুঠো ফুলে'র পরিচর্যায় ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন একটি পরিচ্ছন্ন ব্যঞ্জনা। ফুল আর হৃদয়, হৃদয় আর ফুলের স্পর্শে ব্যঞ্জনাটি হয়ে উঠেছে অনুভববেদ্য। সালমা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী; কারারুদ্ধ বিপ্লবী রওশনের স্ত্রী। সে আন্দোলনে প্রস্তর-কঠোর, হৃদয়ধর্মে কুসুমকোমল। স্বামী আর স্বামীর আদর্শ তার কাছে অবিচ্ছেদ্য; ফলে তার ভালোবাসায় এসেছে পূর্ণতা ও গভীরতা। কবি বজলে হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সে সাহিত্যকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী নয়। সাহিত্যচর্চা করে অবিরল, অথচ ভাষা আন্দোলনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই তার। বজলে ভালোবাসে নারীর দৈহিক সৌন্দর্য, হৃদয়-সৌন্দর্য নয়; ফলে নারীর দুর্বার রূপাসক্তিতে সে বারবার হয়েছে প্ররোচিত। তবে বজলে নারী-লিপ্সু হলেও অর্থ-লিপ্সু নয়; তাই অর্থের বিনিময়ে মাহমুদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে অবলীলায়। গোয়েন্দাকর্মী মাহমুদ বজলে হোসেনের চেয়ে রমণী-বিহারে সমধিক পারদর্শী। সালেহা আর সাহানা- দু'টি তরুণীকেই সে করেছে কলুষিত; এবং এর অনিবার্য পরিণামে সালেহা করেছে আত্মহনন, আর সাহানা হয়েছে প্রত্যাখ্যাত। সৎ ও নির্ভীক কবি রসুল একজন আন্দোলনকর্মী। একুশের চৈতন্যের সমগ্রতা নির্মাণে এই চরিত্রটি হয়ে উঠেছে তাৎপর্যবহ। রানু ও বেণু চরিত্রদ্বয়ের তেমন একটা বিস্তৃতি নেই 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে, তবে একুশের আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কখনো কখনো তাদের উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও তাৎপর্যময়।

শিল্পরীতি নির্মাণের দিক থেকে 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসে লক্ষ করা যায় চিত্রনাট্য-পরিভাষার সার্থক প্রয়োগ। পরিচর্যার ক্ষেত্রে এ উপন্যাসের ভাষা চিত্রাত্মক, আবেগপ্রবণ, কবিতাস্পর্শী, গীতল এবং যথারীতি 'সিনেমাটিক'। উপন্যাসের অবয়ব নির্মাণে জহির রায়হান যেহেতু চলচ্চিত্রানুগ চিত্রল শিল্পরীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ করেছেন; তাই সঙ্গতকারণেই এটির পরিচ্ছেদ বিভাজনে ব্যবহৃত হয়েছে 'ফেড্ ইন' ও 'ফেড্ আউট' (Fade in & Fade out) পদ্ধতি; এবং ঘটনাংশ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পরিচর্যিত হয়েছে 'কাট্-টু-কাট্' (Cut to Cut) পদ্ধতি -

"আকাশে মেঘ নেই।
তবু ঝড়ের সঙ্কেত।
বাতাসে বেগ নেই।
তবু তরঙ্গ সংঘাত।
কণ্ঠে কণ্ঠে এক আওয়াজ, শহিদের খুন ভুলবো না।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বরকতের খুন ভুলবো না।
যেন আকাশ ভেঙে পড়ছে।
পৃথিবী কাঁপছে।
ভূমিকম্পে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ছে দিক্-বিদিক্।
শুধু উত্তর নয়। দক্ষিণ নয়।
পূর্ব নয়। পশ্চিম নয়।
যেন সমস্ত পৃথিবী জুড়ে ছাতে ছাতে, প্রতি ছাতে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-যুবক ফেটে পড়ছে চিৎকারে-
'শহিদ-স্মৃতি অমর হোক'।"[২৪]

খণ্ড খণ্ড চলমান ছবির মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রামের ইতিকথা ও তার চরিত্রপুঞ্জের যথাযথ প্রতিমূর্তি এঁকেছেন জহির রায়হান 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের বিস্তৃত ক্যানভাসে। তাই সঙ্গতকারণেই এই উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও গণ্য হবার যোগ্য। বলাবাহুল্য, নিরীক্ষাধর্মী এই উপন্যাসের বিষয়চেতনা এবং শিল্পগুণ সচেতন পাঠককে মুগ্ধ না করে পারে না।[২৫]

ছয়

জহির রায়হানের 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) উপন্যাসে শিল্পায়িত হয়েছে শ্রেণি-বিভক্ত ও কলোনি-শাসিত সমাজের বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবনের রূপ ও স্বরূপ। প্রতিকূল পরিপার্শ্ব-প্রতিবেশ এবং সময় ও সমাজ পটভূমিতে নাগরিক মধ্যবিত্ত-জীবনের বহুমাত্রিক সঙ্কটকে বাস্তবমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে উন্মোচন করেছেন ঔপন্যাসিক।[২৬] ফলে, এ-উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অর্থনৈতিক কারণে বিপর্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত পরিবারের সামগ্রিক ভাঙনের শব্দচিত্র।[২৭]

জহির রায়হান 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। তবে, তাঁর এই দৃষ্টিকোণ উপন্যাসে সর্বত্রগামী হলেও কাহিনির ঘটনাবর্তে কখনো কখনো দৃষ্টিকোণ প্রয়োগে এসেছে রূপান্তর। কখনো মাহমুদ, কখনো-বা মরিয়মের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সমস্যার গুরুত্ব অনুসারে। এ-উপন্যাসের প্লটবয়নে ঔপন্যাসিক নির্মাণ করেছেন এক নবতর প্রকরণকৌশল। উপন্যাসের কাহিনি তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত- উপসংহারের আগে, তারও আগে যা ঘটেছিল এবং উপসংহার। 'উপসংহারের আগে' অংশটির মধ্য দিয়ে উপন্যাসের সূচনা এবং এখানে একটি নাটকীয় উৎকণ্ঠা নিয়ে পাঠক অবতীর্ণ হয় 'তারও আগে যা ঘটেছিলো' অংশে। 'উপসংহারের আগে' এবং 'উপসংহার' অংশটির মাঝে প্রায় পাঁচ বছরের ব্যবধান; কিন্তু 'তারও আগে যা ঘটেছিল' ঘটনাংশটি এই ব্যবধান পূরণ করেছে অত্যন্ত সুকৌশলে। বলাবাহুল্য, প্লট পরিবেশনায় 'তৃষ্ণা' উপন্যাসের মতো এখানেও ব্যবহৃত হয়েছে 'ফ্ল্যাশব্যাক' পদ্ধতি।

'বরফ গলা নদী' উপন্যাসের শিরোনাম-নিহিত বক্তব্য ধারণ করেছে নায়ক মাহমুদ। কাহিনির সূচনাংশ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ঘটনাবর্তে তার সম্পৃক্তি সঙ্গতভাবেই প্রত্যাশিত; অথচ 'তারও আগে যা ঘটেছিলো' অংশে মরিয়মের উপস্থিতি এবং ঘটনা উপ-ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্তি হয়ে উঠেছে বিশেষ তাৎপর্যবহ, পুরো উপন্যাসেই যা সংলক্ষ্য। অপর চরিত্র মনসুরের সাথে মরিয়মের পরিচয়ের পর থেকেই কাহিনি যেন নির্মাণ করেছে আরেকটি ভিন্ন বৃত্ত। ঘটনাপ্রবাহে অতীতের স্মৃতিদগ্ধ মরিয়মের অন্তর-উন্মোচন, মনসুরের সাথে প্রেম ও পরিণয় এবং তার মর্মান্তিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে ঘটেছে 'তারও আগে যা ঘটেছিল' অংশের পরিসমাপ্তি। ফলে মাহমুদ-কেন্দ্রিক কাহিনি হয়ে উঠেছে অনেকাংশে মরিয়ম-কেন্দ্রিক।

নায়ক মাহমুদ নীতিবান, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ; ন্যায় ও নীতিনিষ্ঠায় তার ব্যক্তিত্ব অবিচল, অনমনীয় এবং প্রস্তর-কঠোর। জহির রায়হানের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা থেকে মাহমুদ চরিত্রটি নির্মিত বলে বোধ হয় এবং সে কারণেই এ চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের মানস-অভিপ্রায়কে ধারণ করেছে অনেকাংশেই। মাহমুদ মিলন পত্রিকার অত্যন্ত স্বল্প বেতনের একজন সাংবাদিক; তাই দারিদ্র্যদীর্ণ পরিবারের সন্তান মাহমুদ কখনো আর্থিক সঙ্কটমুক্ত নয়। আর্থিক সংঘাতে ক্ষতদীর্ণ বরফ-কঠোর মাহমুদের সজল-স্নিগ্ধ কোমলতায় রূপান্তরই হলো ঔপন্যাসিকের মৌল অন্বিষ্ট; এবং এক্ষেত্রে 'বরফ গলা নদী'- উপন্যাসের এই শিরোনামটি উপর্যুক্ত বক্তব্যটিকে করেছে ইঙ্গিতময়। ফলে এদিক দিয়ে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে বিশেষ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাৎপর্যমণ্ডিত। উপন্যাসের অপর চরিত্র মনসুর বিত্তবান পরিবারের সন্তান; ফলে তার চিত্ত-তারল্য অসঙ্গত নয়। মরিয়মের প্রতি তার আচরণ 'গায়ে পড়া', অথচ কৌশলী। মরিয়মের অসুস্থতা এবং তাদের দারিদ্র্যের সুযোগে মনসুর তার বিত্তকে সুকৌশলে ব্যবহার করেছে; এবং এই কৌশল শেষ পর্যন্ত তাকে করেছে লক্ষ্যস্পর্শী। মরিয়ম সজীব ও স্বাভাবিক প্রাণপদার্থে গঠিত একটি চরিত্র। হাজার বছর ধরে-র কিশোরী নায়িকা টুনির মতো মরিয়ম নির্মিত চরিত্র নয়, হয়ে ওঠা চরিত্র- যা উপন্যাসের ঘটনাবর্তে স্বাভাবিক বর্ণে হয়েছে অনুরঞ্জিত। মরিয়ম দারিদ্র্যদীর্ণ, কিন্তু হৃদয়দীর্ণ নয়। আর্থিক সঙ্কটে সে কর্মশীল, স্নেহ-মমতায় সতত হৃদয়বতী; পিতা-মাতা, ভাই-বোন সকলের প্রতি সে প্রাণোত্তাপে সমদর্শী। এ-চরিত্র নির্মাণে জহির রায়হানের শিল্পকৌশল হয়েছে সাফল্যচারী। বরফ গলা নদী উপন্যাসে লিলি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও বাস্তববাদী চরিত্র। সে কঠোর বাস্তববাদী, অথচ কোমল হৃদয়বতী। বলা যেতে পারে, লিলি চরিত্রটি একই সঙ্গে হৃদয়বোধে এবং বাস্তববোধে পরিপুষ্ট ও বিশিষ্ট। জীবনে একাধিকবার প্রেমচর্চা অপরাধ নয়- এটি লিলির অন্তর্গত বিশ্বাস। 'তারও আগে যা ঘটেছিল' পর্বের শেষাংশে শোকাচ্ছন্ন মাহমুদকে উদ্দেশ্য করে লিলির উচ্চারিত সংলাপ কিছুটা অস্বাভাবিক ও অতিনাটকীয় : 'আমি আছি। আমি যে তোমার ওগো, বিশ্বাস করো। ...আমি আছি, ওগো একবার মুখখানি তুলে তাকাও আমার দিকে, একবার চেয়ে দেখো।'[২৮] কিশোরী হাসিনা চরিত্রটি প্রাণচঞ্চলতায় ভরপুর, দুরন্তপনায় ও উচ্ছলতায় সতেজ এবং স্বাভাবিক। হাসমত আলী ও সালেহা বেগম দরিদ্র ও নিম্নমধ্যবিত্ত সন্তানবৎসল পিতা-মাতার প্রতীকী চরিত্র। তারা সন্তানের প্রতি আত্মিক দায়িত্ব পালনে যতটা সক্ষম, ঠিক ততটাই অক্ষম আর্থিক দায়িত্ব পালনে; ফলে আর্থিক অক্ষমতায় তারা সর্বদা বেদনাবিদ্ধ ও ব্যক্তিত্ব-দুর্বল। অপর চরিত্র শাহাদাত প্রেমে যতটা সবল, ততটা সবল নয় আত্মমর্যাদাবোধে; কিন্তু স্ত্রী আমেনার প্রতি তার ভালোবাসা অত্যন্ত গভীর, অন্তরস্পর্শী এবং হৃদয়জাত। তুলনাসূত্রে উল্লেখ্য, শাহাদাতের স্ত্রী আমেনা চরিত্রটি স্বামীর চেয়ে অনেকাংশে দীপিত, ব্যক্তিত্বময়ী। নিদারুণ আর্থিক সঙ্কটেও তার আত্মমর্যাদা অবিচল থেকেছে শেষাবধি; সে নিঃশেষিত হয়েছে হার্দিক রক্তক্ষরণে, কিন্তু জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত থেকেছে আপোসহীন। যদিও রোম্যান্টিক দৃষ্টির চোরাবালিতে 'বরফ গলা নদী' উপন্যাসের পরিণামী অংশ হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক ও 'মেলোড্রামাটিক'। তবুও নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, এ-উপন্যাসের শিল্পরীতি পরিচর্যায় জহির রায়হান আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক; বিশেষত কাহিনির গঠন-প্রকৌশলে এবং ঘটনা ও পরিপার্শ্ব-প্রতিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির প্রাতিস্বিকতা অভিনব, স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত এবং স্বচিহ্নিত -

> "অতীত। বর্তমান। ভবিষ্যৎ।
> ছুরি দিয়ে কেটে কেটে জীবনটাকে বিশ্লেষণ করার মতো প্রবৃত্তি না হলেও-
> জীবনের ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তগুলো, টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো স্মৃতি হয়ে দেখা দেয় মনে।
> সেখানে আনন্দ আছে, বিষাদ আছে।
> ব্যর্থতা আছে, সফলতা আছে।
> হাসি আছে, অশ্রু আছে।
> অতীতের মতো বর্তমানও যেন ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ওঠা আর পড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।
> ভবিষ্যৎ কেমন হবে, তা কেউ বলতে পারে না।"[২৯]

সাত

ষাটের দশকের দ্বন্দ্বজটিল সময়প্রবাহে নাগরিক ও গ্রামীণ সমাজবাস্তবতার অভিক্ষেপে, মনন ও মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে, মানবমনের অন্তর্গূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে এবং নন্দনতাত্ত্বিক শিল্পপ্রয়োগে জহির রায়হান নিঃসন্দেহে একজন শক্তিশালী ও শ্রমনিষ্ঠ কথাশিল্পী। বহমান মানবজীবন ও সমাজের কালিক অভিজ্ঞতার রূপায়ণে তাঁর 'শেষ বিকেলের মেয়ে', 'তৃষ্ণা', 'হাজার বছর ধরে', 'আরেক ফাল্গুন' এবং 'বরফ গলা নদী'- এই পাঁচটি উপন্যাস স্বতন্ত্রমাত্রাস্পর্শী। মানবজীবনের সঙ্কটদীর্ণ ও রক্তাক্ত স্বরূপ উন্মোচনে ঔপন্যাসিক জহির রায়হান তাঁর এই উপন্যাসমালায় গ্রহণ করেছেন 'সিনেমাটিক' পরিচর্যারীতি; ফলে চরিত্রায়ণরীতিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে ব্যক্তিমানসের তথা চরিত্রের দৃষ্টিকোণ, অন্তর্ভাবনা, স্বগতকথন ও মনোবিশ্লেষণ। জহির রায়হান চৈতন্যে সমাজতন্ত্রী, শিল্পবোধে গণতন্ত্রী, জীবনবোধে রোম্যান্টিক, দৃষ্টিতে আবেগপ্রবণ ও চিত্রাত্মক। আর

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 22
Website: https://tirj.org.in, Page No. 189 - 201
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এই অনিবার্য কারণেই তাঁর উপন্যাসের ভাষাশৈলী আবেগী, চিত্রনাট্যধর্মী, বহুবর্ণিল চিত্রলতায় সন্দীপিত এবং কাব্যময়। বস্তু-ঘনিষ্ঠতায় জহির রায়হানের শিল্পীমানস তাঁর উপর্যুক্ত উপন্যাসমূহের বহিরঙ্গে রঙ ফুটিয়েই কেবলমাত্র তৃপ্ত থাকেনি, সেই প্রসাদগুণ এই উপন্যাসগুলির ঘটনা-উপঘটনার মজ্জায় মজ্জায় সংযত আবেদন, বাহুল্য বর্জন ও ইঙ্গিতময় সৌকর্যে অন্তর্লীন; সমাজমুখী-মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অবলোকন শক্তিতে পরিস্নাত। এই তীব্র, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্ভেদী জীবন ও সমাজ পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যই বাংলা উপন্যাসের ধারায় কথাশিল্পী জহির রায়হানের সুনির্দিষ্ট আসন চিহ্নিত করেছে; তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে।

Reference:

১. হোসেন, সৈয়দ আকরম, ‘রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ’, ১ম সং-১৯৮৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ১৭
২. খান, রফিকউল্লাহ, ‘বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : উপন্যাস’, করুণাময় গোস্বামী (সম্পা.), ১ম সং-১৯৯৪, সুধীজন পাঠাগার, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, পৃ. ১৪৪
৩. খান, রফিকউল্লাহ, ‘বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ’, ১ম সং-১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১৬০
৪. রায়হান, জহির, ‘শেষ বিকেলের মেয়ে’, ৮ম সং-২০২২, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৩৩
৫. তদেব, পৃ. ৪৭
৬. তদেব, পৃ. ৬১
৭. তদেব, পৃ. ৬৮
৮. তদেব, পৃ. ১৪
৯. রায়হান, জহির, ‘তৃষ্ণা’, ১ম সং-১৯৬২, চিত্রালী, ঢাকা, পৃ. ৮১
১০. তদেব, পৃ. ৯৪
১১. তদেব, পৃ. ৯৯
১২. তদেব, পৃ. ১০৭
১৩. তদেব, পৃ. ১১৩
১৪. তদেব, পৃ. ১১৭
১৫. খান, রফিকউল্লাহ, ‘বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : উপন্যাস’, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৪
১৬. মোঃ সাইফুজ্জামান, গাজী, ‘বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ’, ২য় সং-২০১০, মনন প্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৪৯
১৭. রায়হান, জহির, ‘হাজার বছর ধরে’, ৭ম সং-২০২১, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ১৭
১৮. তদেব, পৃ. ২৩
১৯. তদেব, পৃ. ৪৩
২০. রায়হান, জহির, ‘আরেক ফাল্গুন’, ৫ম সং-২০১৬, অনুপম প্রকাশনী, পৃ. ২০
২১. তদেব, পৃ. ৪৭
২২. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’, ১ম সং-১৯৯৭, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২১
২৩. রায়হান, জহির, ‘আরেক ফাল্গুন’, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬
২৪. *তদেব*, পৃ. ৬৮
২৫. আলী, মুহম্মদ ইদরিস, ‘আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল’, ১ম সং-১৯৮৮, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ১২৫
২৬. খান, রফিকউল্লাহ, ‘বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ : উপন্যাস’, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫
২৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ‘বাংলাদেশের সাহিত্য’, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২০

২৮. রায়হান, জহির, ‘বরফ গলা নদী’, ৬ষ্ঠ সং-২০১৩, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, পৃ. ৪২

২৯. তদেব, পৃ. ৫৯

Bibliography:

আকরগ্রন্থ :

রায়হান, জহির : শেষ বিকেলের মেয়ে, ৮ম সং-২০২২, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
: তৃষ্ণা, ১ম সং-১৯৬২, চিত্রালী, ঢাকা।
: হাজার বছর ধরে, ৭ম সং-২০২১, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
: আরেক ফাল্গুন, ৫ম সং-২০১৬, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।
: বরফ গলা নদী, ৬ষ্ঠ সং-২০১৩, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থ :

আখতার, শাহীদা, *পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা উপন্যাস* (১ম সং-১৯৯২), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
আলী, মুহম্মদ ইদরিস, *আমাদের উপন্যাসে বিষয়চেতনা : বিভাগোত্তর কাল* (১ম সং-১৯৮৮), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
কায়সার, শান্তনু, *বাংলা কথাসাহিত্য : ভিন্নমাত্রা* (১ম সং-২০০১), ঐতিহ্য, ঢাকা।
খান, রফিকউল্লাহ, *বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ* (১ম সং-১৯৯৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
ঘোষ, বিশ্বজিৎ, *বাংলাদেশের সাহিত্য* (১ম সং-১৯৯৭), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
চৌধুরী, জামিল (সম্পা.), *বাংলা বানান-অভিধান* (৬ষ্ঠ সং-২০১৬), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।
চৌধুরী, নাজমা জেসমিন, *বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি* (৩য় সং-১৯৯১), মুক্তধারা, ঢাকা।
মোঃ সাইফুজ্জামান, গাজী, *বাংলাদেশের উপন্যাসে ভূমি ও মানুষ* (২য় সং-২০১০), মনন প্রকাশ, ঢাকা।
শিকদার, আবদুল হাই, *বাংলা সাহিত্য : নক্ষত্রের নায়কেরা* (১ম সং-২০০৪), হাতেখড়ি, ঢাকা।
সুলতানা, ফরিদা, *বাংলাদেশের উপন্যাসে জীবনচেতনা* (১ম সং-১৯৯৯), বাংলা একাডেমি, ঢাকা।